একক ৩ ❑ সুখ না দুঃখ? ঃ সৌন্দর্যবুদ্ধি ❑ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৩.১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যপরিচয়
৩.২ 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটির সাধারণ পরিচয়
৩.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মনন ও রচনারীতি
৩.৪ প্রবন্ধদুটির নিবিড়পাঠ
৩.৪.১ 'সুখ না দুঃখ?'
৩.৪.২ 'সৌন্দর্যবুদ্ধি'
৩.৫ 'সুখ না দুঃখ' ও 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' প্রবন্ধদুটির বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ
৪.০ সামগ্রিক অনুশীলনী ঃ 'সাম্য' ❑ 'কৌতুকহাস্য' ❑ 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' ❑ 'সুখ না দুঃখ?' ❑ 'সৌন্দর্যবুদ্ধি'
৪.১ বিস্তৃত প্রশ্ন
৪.২ অবিস্তৃত প্রশ্ন
৪.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
৫.০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ ❑ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য-পরিচয়

রবীন্দ্র-পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক হলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪—১৯১০) । বাংলা প্রবন্ধকে বিজ্ঞানচেতনা ও দার্শনিক জিজ্ঞাসাতে পুষ্ট করে ভিন্ন ধরনের মাত্রা যোগ করেছেন তিনি। তবে বিজ্ঞান ও দর্শনকে অবলম্বন করলেও সাহিত্যকে রসাস্বাদী করে তুলবার প্রতি তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ রচনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে একজন সমালোচক জানিয়েছেন—"কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রথমেই তার মূল ও পারিপার্শ্বিকতার সন্ধান, লব্ধ তথ্যকে পুনরায় সুতীক্ষ্ণ মেধায় আত্মপর্যালোচনা এবং শেষ পর্যন্ত তুলনামূলক বিচারের মধ্য দিয়ে বিষয়টির আনুপূর্বিক গুরুত্বকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। বিষয় অনুসারে তাঁর বিশ্লেষণরীতি অত্যন্ত সতর্কভাবেই গভীর চিন্তার অনুসারী; চিন্তার ধারা অভ্রান্ত এবং সিদ্ধান্তের অনুকূলে নির্মোহ। আবার বিষয়ের গুরুত্বকে পাঠকমনে চিহ্নিত করবার জন্য প্রয়োজনে তা উদাহরণমুখী এবং রসপরিবেশনেও কার্পণ্য করেনি।" (ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৮৫)

—সমালোচকের সঙ্গে সহমত প্রদর্শন করি আমরা। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর প্রবন্ধে মননমূলক জীবন-জিজ্ঞাসাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা, সর্বোপরি তাঁর সত্যান্বেষী মন এজাতীয় রচনাতে তাঁকে উৎসাহী করেছিল।

মুর্শিদাবাদের টেয়া গ্রামে-বৈদ্যপুরের ত্রিবেদী পরিবারে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম। পিতামহ ব্রজসুন্দর এবং পিতা গোবিন্দসুন্দর দুজনেরই ছিল সাহিত্যানুরাগী। পিতামহ 'মাধব-সুলোচনা' নামে একটি নাটক এবং 'স্বর্ণসিন্দুর সিংহ' বা 'গৌরলাল সিংহ' নামে একটি প্রহসন লিখেছিলেন। পিতা গোবিন্দসুন্দর 'বঙ্গাবালা' নামে একটি উপন্যাস এবং 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। পরে রিপন কলেজে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'নবজীবন' পত্রিকায়। প্রকাশকাল ১২৯১ বঙ্গাব্দ, পৌষ সংখ্যা। রচনাটির নাম 'মহাশক্তি'। রামেন্দ্রসুন্দরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—প্রকৃতি (১৮৯৬), জিজ্ঞাসা (১৯০৪), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬), কর্মকথা (১৯১৩), নানাকথা (১৯২৪)।

৩.২ ❑ 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটির সাধারণ পরিচয়

'জিজ্ঞাসা' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দ্বিতীয় গ্রন্থ। বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা, দর্শনচেতনা এবং শিল্প ভাবনার বিচিত্র সমন্বয় রয়েছে গ্রন্থটিতে। 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা বাইশ। (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ অনুযায়ী। প্রবন্ধগুলির নাম, পত্রিকায় প্রকাশকালের একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে—

১। সুখ না দুঃখ?	সাধনা, মাঘ ১২৯৯
২। সত্য	সাহিত্য, জৈষ্ঠ্য ১৩০০
৩। জগতের অস্তিত্ব	সাধনা, আষাঢ় ১৩০০
৪। সৌন্দর্য-তত্ত্ব	সাধনা, ভাদ্র ১৩০০
৫। সৃষ্টি	সাধনা, অগ্রহায়ন ১৩০০
৬। অতিপ্রাকৃত—প্রথম প্রস্তাব	সাধনা, ফাল্গুন ১৩০০
৭। অতিপ্রাকৃত—দ্বিতীয় প্রস্তাব	বঙ্গদর্শন আশ্বিন ১৩০১
৮। আত্মার অবিনাশিতা	সাহিত্য, আশ্বিন ১৩০১
৯। কে বড়?	ভারতী, চৈত্র ১৩০২
১০। মাধ্যাকর্ষণ	সাহিত্য, পৌষ ১৩০৩
১১। এক না দুই	ভারতী, মাঘ ১৩০৩
১২। অমঙ্গালের উৎপত্তি	সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০৪
১৩। বর্ণ-তত্ত্ব	ভারতী, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৪
১৪। প্রতীত্যসমুৎপাদ	সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০৫
১৫। পঞ্চভূত	পুণ্য, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০৫
১৬। উত্তাপের অপচয়	ভারতী, ফাল্গুন ১৩০৫
১৭। ফলিত জ্যোতিষ	প্রদীপ, চৈত্র ১৩০৫
১৮। নিয়মের রাজত্ব	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫
১৯। সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি	প্রদীপ, মাঘ ১৩০৭
২০। মুক্তি	বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১০
২১। মায়া-পুরী	সাহিত্য, কার্ত্তিক ১৩১৬
২২। বিজ্ঞানের পুতুলপূজা	আর্য্যাবর্ত্ত, অগ্রহায়ণ ১৩১৭

—আমাদের পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ দুটি হল—'সুখ না দুঃখ' এবং 'সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি'। প্রথম প্রবন্ধটি দার্শনিক জিজ্ঞাসা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। জীবনের ক্ষেত্রে সুখ না দুঃখ কার পরিমাণ অধিক তা নিয়ে প্রাবন্ধিক তাঁর ভাবনা জানিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিকে শিল্পজিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়েছে। এই শিল্পজিজ্ঞাসাকেও তিনি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেই মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছেন।

৩.৩ ❑ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) মনন ও রচনারীতি ঃ

রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রনাথ বসু প্রীতিভাজনেষু' নিবেদিত 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রচনা। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী করে বিজ্ঞানচর্চার একেবারে প্রাথমিক বিষয়গুলি নিয়ে পাঠকদের বিজ্ঞান সম্পর্কিত কৌতূহলটি জাগিয়ে তোলাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। যদিও দায়িত্বটা প্রথমে তিনি দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক 'শ্রীমান প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, এম এস্ সি' কে কিন্তু তিনি অচিরেই বুঝেছিলেন বিজ্ঞানের যথাযথ পাণ্ডিত্য নিয়ে এ গ্রন্থ রচনা করতে গেলে পারিভাষিক প্রতিবন্ধকতায় এ এমন বস্তু হয়ে হয়ে উঠবে যা গলাধঃকরণ করা যাবে না, এ জাতীয় রচনার জন্যে একান্তভাবে দরকার অন্ধবিশ্বাসকে মূঢ়তা জ্ঞান করে সাহিত্যরসিকের মেজাজ নিয়ে নব্যপ্রাকৃততত্ত্ব তথা বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্যে মনকে বিস্ফারিত করে তোলা। যার ফলে কৌতূহলী-মেধাবী ছাত্রদের পক্ষে 'বিজ্ঞানের আঙিনা'য় প্রবেশ করা সহজ হয়ে উঠবে। তিনি যে কিছুটা হলেও 'অনধিকার প্রবেশ' করছেন সে-সম্পর্কে সচেতন হয়েও বুঝতে পারছেন সময়ের অত্যাবশ্যক তাগিদা। এ কাল কোনভাবেই বিজ্ঞানচর্চার দীনতা নিয়ে আধুনিক যুগের প্রত্যন্তদেশে পড়ে থেকে অকৃতার্থ হয়ে দিনযাপন করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের মতো সময়ের এই ডাক শুনতে পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। তিনিও রচনা করেছিলেন 'বিজ্ঞান রহস্য'এর মতো গ্রন্থ সেই ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দেই। যার বিষয় ছিল প্রাথমিক প্রাকৃত কিছু বিষয়। যেগুলি মৌলিক রচনা তো নয়ই আবার অনুবাদও নয়, তরল না করে সরল সহজ ভাবে মূল লেখকদের 'মতাবলম্বন করিয়া লিখিত।' মূল লেখকেরা ছিলেন টিন্ডল, গ্লেসর, হাক্সলি, লায়েল প্রমুখেরা। রবীন্দ্রনাথের মতো বঙ্কিমচন্দ্রেরও যে দ্বিধা না-ছিল তা জোর দিয়ে বলা যাবে না কিন্তু জোর দিয়ে বলা যাবে সময়ানুবর্তিতাই বঙ্কিমচন্দ্রকে এ কার্য সমাধানে অস্থির করে তুলেছিল। 'ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞান বলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞান বলেই ইহা রক্ষা করিতেছেন' সুতরাং বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলনের এক শক্ত পাটাতনও আমাদের নির্মাণ করতে হবে অনতিবিলম্বেই। ১২৭৯-এর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার 'ভাদ্র' সংখ্যায় এই নিমিত্তেই তিনি 'ভারতীয় বিজ্ঞানসভার' একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছিলেন, যাতে দেশীয় ধনীরা যথাযথ ভূমিকা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন, অন্যথায় বিড়ম্বিত বিপর্যস্ত সময়ের কালিমা সরবে না, এতদুদ্দেশে মহোদয় ইংরেজ পণ্ডিত ও শাসকদের প্রতিও যথাযথ প্রার্থনা করেছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও ছিলেন পূর্ববর্তী দুজনের মতো একই মনোভাবের শরিক। অধিকন্তু একটা আনুকূল্যও ছিল, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে প্রথম স্থান'ই শুধু অধিকার করেন নি, ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'এম এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রথম স্থান' অধিকার করেন এবং পরের বছর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র নিয়ে প্রেমচাঁদ বৃত্তিও অর্জন করেছিলেন। তাঁর সে-সব বিষয়ের দক্ষতা নিয়েও পরীক্ষকসমাজ মুক্তকণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন "The candidate who took up physics and Chemistry is perhaps the best student that has as yet taken up these subjects at this examination." রামেন্দ্রসুন্দর স্বাভাবিকভাবেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে উজ্জীবিতই হয়ে উঠেছিলেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বাংলা সাহিত্যের যশোকীর্তি অধ্যাপকের মতে, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরই রামেন্দ্রসুন্দরের স্থান।

সত্যের খাতিরে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়ের এই স্থান-নির্ণয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে সম্ভবত আরও উঁচুতেই বসানো যেতে পারে কেননা 'প্রকৃতি' গ্রন্থে physics-এর দুরূহ বিষয়গুলি নিয়ে যেমন 'সৌরজগতের উৎপত্তি', 'আকাশ-তরঙ্গ', 'পৃথিবীর বয়স', 'জ্ঞানের সীমানা', 'প্রাকৃতসৃষ্টি', 'প্রকৃতির মূর্ত্তি', 'হর্ম্মান হেলমহোলৎজ', 'ক্লিফোর্ডের কীট',

'প্রাচীন জ্যোতিষ, মৃত্যু', 'প্রাচীন জ্যোতিষ— দ্বিতীয় প্রস্তাব', 'আর্যজাতি', 'প্রলয়', 'আলোকতত্ত্ব', 'পরমাণু'—— ব্যাখ্যাবিজ্ঞান সহ এত সহজ সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেছেন তা বাংলাসাহিত্যের অতুলনীয় ঐশ্বর্য হয়েই আছে। যদিও এ বিষয়ে তাঁর সাহিত্য-এষণা ও ভাষাজ্ঞান যথাযথ সাহায্যও করেছিল—— বয়ঃসন্ধির স্তর পর্যন্ত তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল লেখক হবার। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যও পুরোদমে পাঠ করতেন। নিজস্ব জীবন-কথায় জানিয়েছেন, ফার্স্ট আর্টস বা এনট্রান্স পরীক্ষায় তিনি আশানুরূপ ফল করতে পারেননি সাহিত্যপ্রীতির ফলেই। ভাষায় ছিল তাঁর অপরিসীম দখল। ভাবকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করার ব্যাপারে তাঁর ছিল এক তুলনারহিত ক্ষমতা। বিষয়ের সঙ্গে যুক্তবেণী রচনা করে যা পাঠককে অনায়াসেই আবিষ্ট করে দিতে পারত, যুক্তিতর্কের নির্মেদ সমুচ্চয়তা নিয়ে। "সত্য অর্থে যাহা আমাদের পক্ষে সত্য ; নিরপেক্ষ নহে— সাপেক্ষ ; পূর্ণ নহে আংশিক ; সার্ব্বভৌমিক নহে— প্রাদেশিক ; সমান নহে— তৎকালিক।" (সত্য) আবার "কিন্তু একটা কথা আছে, ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শনমাত্র; ভূয়ঃ শব্দের অর্থ ভূয়ঃ, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহু কাল ব্যাপিয়া দর্শন ও বহু দেশ ব্যাপিয়া দর্শন ; উহা চিরকাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া দর্শন নহে। চিরের সহিত তুলনায়, সর্ব্বের সহিত তুলনায়, ভূয়োও নগণ্য মাত্র। উভয়ের তুলনা হয় না। মাধ্যাকর্ষণের বর্ত্তমান নিয়ম, কাল ছিল । পরশু ছিল, শত বৎসর বা কোটি বৎসর আগেও ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? আবার মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম লোষ্ট্রখণ্ডে আছে, তাহাই চন্দ্রে আছে, পৃথিবীতে আছে, শনৈশ্চয়ের মেখলাতে আছে ও বরুণ গ্রহের পার্শ্বচরে আছে, লুব্ধক তারকা ও তাহার অনুচরে আছে ; কিন্তু সর্ব্বত্র আছে কে বলিল? ভূয়োদর্শনের দৃষ্টি তত দূর বিস্তৃত নহে ; সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর নাই। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের যে সার্ব্বভৌমিকত্ব বিশ্লেষণ দেওয়া যায়, তাহা অনেকটা গায়ের জোর মাত্র।" (সত্য)

বাংলাভাষার পরিচর্যায় তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। বিষয়ের ন্যূনতা-ঊনতা তাঁর সম্পাদিত কর্মে যেমন স্থান পেত না, ভাষারও নিরর্থক দুর্বোধ্যতায় কোন প্রশ্রয় ছিল না, 'বিষয় যখন বিজ্ঞান তখন পারিভাষিক কিছু বাধা তো থাকবেই' এ যুক্তিকেও তিনি সর্বতোভাবে খণ্ডন করেছিলেন, "বাঙ্‌লা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। মাতৃভাষাকে এতদর্থে সুগঠিত করিয়া লইবার জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক, আপনাদিগকেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখা যদি বঙ্গভাষার এই অঙ্গের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

আমাদের বাঙ্‌লা ভাষা বর্ত্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অস্পষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহে। আমি আশা করি, এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা বিবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যতাই আমার বাক্য সমর্থন করিবে।" (১৩২০ সনের কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৭ম অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি রূপে এই ভাষণটি দেন রামেন্দ্রসুন্দর)

শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনের এই কুশলতার সঙ্গে তাঁর রচনারীতিতে মিশেছে স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা। কোন বিষয়েই শেষ কথা বলার বা মীমাংসা করার আস্ফালনময় উগ্রতা নেই, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জাগাতে পারেন মাত্র, ব্যাখ্যাবিশ্লেষণসহ অবতারণা করতে পারেন সমস্যাটির। আর কিছু নয়। বিতর্কিত বিষয়ে একেবারে তৌলদণ্ডেই এ-পক্ষ ও-পক্ষ সে-পক্ষের মতামতাগুলি সাজিয়ে দিয়ে নিজে নিরপেক্ষ থেকেছেন—— অন্তত থাকবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানুষের পক্ষে কী সম্ভব সেই-নিরপেক্ষতা অবলম্বন? প্রবণতা বা পক্ষপাতিত্ব ঠিকই একদিকের পাল্লা ভারী করে দেয়। সেক্ষেত্রেও প্রবন্ধকার যথাযথ নম্রতায় সুধীজনের মার্জনা চেয়ে নেন। "মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক্ দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা

মার্জ্জনা করিবেন।" (সুখ না দুঃখ) এতদ্ বিষয়ে তাঁর এই মানসিকতা যা রচনাগত একটা স্টাইলে পর্যবসিত হয়েছিল তার বড়ো সাক্ষ্য দিতে পারে 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নামের গ্রন্থটি। অনেক বিদগ্ধজন মনে করেন Houston Stewart Chamberlain-এর 'Foundation of the Nineteenth Century' গ্রন্থের আদলে রামেন্দ্রসুন্দর রচনা করলেও Chamberlain-মানসিকতার দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তই ছিলেন—— Chamberlain ইউরোপের Culture-history লিখতে গিয়ে গায়ের জোরে তাঁর প্রিয় মতামতটি চাপিয়ে দেবার যে--প্রয়াস আদ্যন্ত করে গেছেন, ভারতীয় সভ্যতার কথকতায় সেই-গোয়ার্তুমির কোন পরিচয় দেননি, কোন ভাবেই dogmatic হয়ে যাননি।— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দীর্ঘজীবী ছিলেন না। মাত্র পঞ্চান্ন বৎসরের জীবনে তিনি দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই এক অনিন্দ্যসুন্দর বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। প্রথমটি ছিল রিপন কলেজ, দ্বিতীয়টি 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'। প্রথমটিতে অতিবাহিত করেছিলেন ১৮৯২ থেকে ১৯১৯। প্রথম বারো বছর অধ্যাপক রূপে, বাকি ১৬-১৭ বছর অধ্যক্ষরূপে। দ্বিতীয়টিতে পদার্পণ করেছিলেন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। আমৃত্যু ছিলেন পরিষদের সক্রিয় কর্মী হয়েই। কোন না কোন সময়ে সম্পাদক থেকে সভাপতি সব কটি পদেই কৃত হয়েছিলেন। কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কত নিবিড় ছিল সে নিয়ে অনেক কথাই আছে জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, বিপিনবিহারী গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতিদের বিশদ লেখালেখিতে।

একালের পাঠকের পক্ষে সে-সব লেখন-সামগ্রীর মধ্যে দিয়ে লেখালেখির মূলে অর্থাৎ তাঁর চৈতন্য-মূলে পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটে না। দুটো প্রতিষ্ঠানকেই তিনি যুক্ত করে নিয়েছিলেন তাঁর স্বদেশানুরাগ ও বাংলাভাষা প্রীতির মধ্যে দিয়ে। রিপন কলেজের তাঁর সহকর্মী-ছাত্রদের মুখ থেকে জানা গিয়েছে সেকালে তিনি পদার্থবিদ্যা-রসায়নের মতো বিষয়গুলির পাঠ দিতেন ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ভাষার মাধ্যমেও। কেন বাংলা ভাষায় বিষয়গুলিকে গ্রহণযোগ্যতায় ছাত্রদের মগজের গভীরে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে না এই রকমের এক প্রতিজ্ঞা নিয়েই শ্রেণিকক্ষে পদচারণা করতেন, মুখে থাকত অনর্গল বাকবিভূতি। কীর্তিধ্বজ অধ্যাপক রূপে তাঁর নাম ছড়িয়েও পড়েছিলেন। দু'দুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়-বিভাগে উপদেশক-অধ্যাপক রূপে আমন্ত্রিতও হয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, "রামেন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নহে, এই জন্য বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাঙ্গালী শ্রোতার মজলিসে, রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই। তিনি তৃতীয়বার অনুরুদ্ধ হইয়া লেখেন—— 'ইংরেজি রচনায় আমি অভ্যস্ত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দিলে আমি 'বেদ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি।' তখনকার ভাইসচ্যান্সেলার স্যর ডাক্তার দেবপ্রসাদবাবু রামেন্দ্রসুন্দরকে সে অধিকার দান করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। ইতিপূর্বে বাঙ্গালা কেতাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছি বটে, কিন্তু আমরা বলিব, বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শুভ মুহূর্তের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষার কোনও স্থান ছিল না।' (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সাহিত্য-আশ্বিন-১৩২৬)

কলেজকে করে তুলেছিলেন আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র করেই— ছাত্র-অধ্যাপক সম্পর্কে, অধ্যাপকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে, অধ্যাপক-অধ্যক্ষ-ছাত্র-কর্মচারীদের শুভবুদ্ধিকে তিনি উদ্দীপিত করে দেশগঠনের জাতিগঠনের এক ক্লান্তিহীন প্রয়াসেই যেন তিনি মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তবু তিনি বুঝেছিলেন পরীক্ষাকেন্দ্রিক পড়াশুনো, পাঠ্যসূচির বিষয়সর্বস্বতা, কর্তৃপক্ষের প্রতি মান্যমানতায় তিনি যা তিনি করতে চান ঠিক তা করা যাবে না—— সেই-পরিসরকেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'-এর কর্মকাণ্ডে। স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশপ্রিয়তার নৈবেদ্য রচনা করে করেছিলেন আলাপ-আলোচনা-বক্তৃতা-সম্বর্ধনার নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। অথচ যার মধ্যে ছিল না প্রাদেশিক কোন উন্মাদনা, আঞ্চলিক সংকীর্ণতা, অন্য ভাষার প্রতি কোন বৈরিতা। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাবৈশ্বর্যে আগামী প্রজন্মকে

শিক্ষিত-দীক্ষিত করে তোলার প্রয়াস। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধনোদ্দেশে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে যে স্যাডলার কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। সেখানে তিনি মনোবেদনা লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি "Western education has given us much ;we have been great gainas ; but there has been a cost, a cost as reyards culture ; a cost as regards respect for self and reverence for other, a cost as regards the noblity and dignity of life."

রামেন্দ্রসুন্দরের মনোজগতে শেষদিকে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। বিশেষত তাঁর কর্মপথের জিজ্ঞাসা নিয়ে, ডারউইন ক্লিফোর্ড হেল্মহোল্টস-প্রদর্শিত পথ কী সেই-বাসনা পূর্ণ করতে পারবে? ব্যবহারিক সত্য বা Pragmatic Truth ও শাশ্বত সত্য বা Absolute Truth একই চূড়ান্তে উপনীত করতে পারবে। তাঁর ভাষায় 'কিরূপ পথ দিয়া এতদূর আসিলাম, আমার গন্তব্য কি, গন্তব্যে পঁহুছিতে হইলে, আমার এ পথ দিয়া আরও যাওয়া উচিত, কি এ পথ ছাড়িয়া অন্য রাস্তা দেখা কর্ত্তব্য।' কেমন যেন সংশয়ান্বিত হয়ে উঠেছেন ক্রমশ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা নিয়ে। সমষ্টির উত্তরণের জন্যে বিজ্ঞান প্রয়োজন। যে উন্নয়ন ভিন্ন মানবজীবন তার বনিয়াদ রচনা করতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের সেই-চরম আকঙ্ক্ষা মুক্তি বাসনায় বিজ্ঞান কতদূর কী করতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর তাই শেষজীবনে প্রথম জীবনের সব চিন্তা-চেতনার কেমন যেন পুনশ্চিন্তায় রত হয়ে উঠেছেন, শনৈ শনৈ দার্শনিক হয়ে উঠেছেন। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সংশয়মুক্ত হয়ে জীবনের মহত্তর-বৃহত্তর সত্যান্বেষণে তৎপর হয়ে উঠেছেন। যার সাক্ষ্য দেয় 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় জাতিগত উন্নয়নের প্রশ্নে, সমষ্টির ব্যবহারিক জীবনের সমস্যাগুলি সুরাহার প্রশ্নে তার দেশানুরাগ এতটুকু স্থানচ্যুত হয়নি। শাসক ইংরেজের শোষণ-শাসনের প্রতি অভিযোগের কোন স্খলন ঘটেনি। বরং বড়ো প্রাপ্তি হয়ে উঠেছিল তাদের নির্মমতা-শঠতা-প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও রসমার্গের অগ্রণীরাও শেষ অবধি রাস্তায় নামছে এই আশ্বস্ততায়। "রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের কয়েকদিন পূর্ব্বে 'নাইট' উপাধি বর্জন করিয়া নব-ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার তাঁহার পদত্যাগ-পত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমি উত্থানশক্তি রহিত আপনার পায়ের ধুলা চাই। সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহাকে মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রর এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন ; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহা নিদ্রায় পরিণত হইল।" (সাহিত্য, আশ্বিন সংখ্যা ১৩২৬)

৩.৪ ❑ প্রবন্ধদুটির নিবিড় পাঠ

৩.৪.১ 'সুখ না দুঃখ?'

মানুষের জীবন অবিরত সুখ-সন্ধানী। সুখ সম্পর্কিত বোধের পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু সে যেভাবেই বুঝুক না কেন প্রত্যেকেই সুখের অন্বেষণে রত। প্রত্যেক মানুষ এই যে নিজ নিজ লক্ষ্যের অভিমুখে চেষ্টা চালাচ্ছে তারই সমবেত ফলে জগৎ চলছে। জীবজগতে অভিব্যক্তি তারই ফলাফল।

তবে মনুষ্যমাত্রই সুখান্বেষণে রত থাকলেও মানুষের জীবনে সুখের ভাগ বা দুঃখের ভাগ বেশি তা স্থির হয়নি। কারও মতে জীবনে সুখের ভাগই অধিক, আবার কারও মতে দুঃখের পরিমাণ সুখের পরিমাণ থেকে চিরকাল বেশি।

প্রথম পক্ষের এ ব্যাপারে মূল কথাটি হল এই ঃ —জীবনে সুখের পরিমাণই বেশি, জীবনের অস্তিত্বই তার

প্রণাণ। আর তাছাড়া সুখ না থাকলে মানুষ বাঁচতে চাইবে কেন? মানুষ যে বাঁচতে চায়—এর মধ্যেই সুখের মাত্রাধিক্যের প্রমাণ আছে। "মোটের উপর মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বরক্ষার্থ প্রয়াসই বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যথেষ্ট উত্তর।"

বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মশাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করলে দুঃখের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অভিব্যক্তিবাদের মূল কথা হল দুঃখের বিনাশ এবং সুখের বৃদ্ধি। আর দুঃখ না থাকলে সুখের বৃদ্ধির কথা আসত না, অভিব্যক্তি ঘটত না, যা সমাজের পক্ষে মোটের উপর সুখপ্রদ, তাই হল ধর্ম; আর যা দুঃখপ্রদ, তাই হল অধর্ম। ধর্মাধর্মের এই তাৎপর্য দিয়ে 'সুখ' শব্দটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে প্রাবন্ধিক চাননি। 'সুখ' শব্দে কেবল নিম্নপর্যায়ের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিমূলক সুখ বলতেও প্রাবন্ধিক নারাজ। যা জীবনের উন্নতিবর্ধক তাই সুখ। মানুষের তথা সমগ্র মানবসমাজের উন্নতি ক্রমবর্ধমান ইতিহাস এ-কথা সমর্থন করে। আর তাহলেই মানতে হয় সুখের মাত্রাও ক্রমশ বাড়ছে। এই সুখ পরিপূর্ণ তা বলা যায় না, কিন্তু তাদের গতি পূর্ণতার দিকে। প্রাবন্ধিক জানান—".....সর্বক্ষণেই তদানীন্তন দুঃখের মাত্রা অপেক্ষা তদানীন্তন সুখের মাত্রা অধিক, নতুবা লোকে জীবন বর্দ্ধনের প্রয়াস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস পাইর্ত...."।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ দিয়ে জীবনকে বিচার করতে গেলে প্রাথমিকভাবে জীবনের সুখময়কে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ যোগ্যতমের জয়-এই ভাবনার দ্বারা বোঝা যায় হিংসা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়েই উন্নতির পথে যেতে হয়। দুঃখ অস্তিত্বহীন এরকম কথা বললে জীবনদ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তিবাদের আর কোনও ভিত্তি থাকে না। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রকৃতির সমুদায় কার্যধারা দুঃখ লাঘবের অভিমুখে ধাবিত।

দ্বিতীয় পক্ষের যাঁরা অর্থাৎ যাঁরা জীবনকে দুঃখময় মনে করেন, তাঁরা অন্যপক্ষের যুক্তিতর্কের কথা না শুনে সুখের পরিমাণ যে অধিক তার নিদর্শন দেখতে চান। যদি দারিদ্রকে দুঃখ বলা যায় তাহলে তা সংসারে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। আবার অজ্ঞানকে দুঃখ তাও জগৎসংসারে বহুলপরিমাণে প্রত্যক্ষ গোচর হয়। অধর্মকে দুঃখ বললে, পৃথিবীতে তো অধার্মিকই অধিক। জীবনচেষ্টা আমরা যাকে বলতে চাই তা আসলে দুঃখলোপের প্রয়াসমাত্র, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পণ্ডশ্রম মাত্র। ফলে বাঁচবার ইচ্ছা সুখের আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না, দুঃখকে নিবারণের ইচ্ছা; কিন্তু নিবারণ ঘটে না। প্রাবন্ধিকের ভাষায়—"জীবন দুঃখময়, যেহেতু জীবন জীবন।"

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে দুঃখ মাত্রা হ্রাস পাচ্ছে—এরকম বলা যাবে না। যার চেতনা নেই, তার কোনও দুঃখ নেই। অনুন্নত জীবের থেকে উন্নত জীবের অনুভূতি বেশি, সাধারণ মানুষের তুলনায় অসাধারণ মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ণ। এইজন্যই বলা যায়—"দুঃখনুভব শক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি।"

মানুষ বেঁচে আছে এবং বাঁচতে চায়, কিন্তু এর মধ্যে সুখের প্রমাণ হয় না। মানুষ অন্ধশক্তির হাতে পুতুলমাত্র। অথচ দুঃখ এড়াতে সে সদা তৎপর, দুঃখকে অতিক্রমই করতে গিয়ে আবার দুঃখে পড়ছে, তবুও তার জ্ঞান হয় না, তবুও সে বাঁচতে চায়।

দুঃখবাদীদের প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানের নাম। সভ্যতার প্রাগ্রসরমানতা এবং জ্ঞানের বিকাশ দুঃখ বাড়াবেই, ফলের সুখের আশা ত্যাগই শ্রেয়। কামনা-বাসনা নিবারণই মানুষকে দুঃখ এড়াতে সাহায্য করতে পারে।

এসেছে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও দুঃখকে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা। বৈদিক আর্যরা দুঃখবাদী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জীবনে অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধ ধর্মকে তারই পরিণতি বলেছেন প্রাবন্ধিক। দুঃখের নিগড় থেকে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের চেষ্টাই বৌদ্ধধর্মের মূল কথা।

ভারতীয় দর্শনের অনুভবই ভারতীয় সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে—এরকম সর্বদা বলা যায় না। এর কারণ হয়তো কাব্যে প্রতিফলিত জীবন কবির আত্ম-অনুভবের প্রতিবিম্বন। কালিদাসের কাব্য পড়লে সুখ ও সৌন্দর্য ছাড়া কিছু

ভোগ করেছিলেন মনে হয় না। শোকাকুলা রতিকেও তিনি দেখেন বসুধালিঙ্গানধূসরস্তনী। আবার 'রামায়ণ মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ-সঙ্গীত'। কিন্তু দুঃখ আছে বলেই রামায়ণে বৈরাগ্যের উপদেশ নেই। বরং জীবনের কর্তব্য সম্পাদন, সমাজসেবা ইত্যাদি উপাদেশ রয়েছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে দেখলে দেখি,—প্রকৃতি নিষ্ঠুর, জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির জীবন অহরহ উৎসর্গ করছে। আবার জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য, তাও জোর দিয়ে বলা যায় না। জীবের জাতীয় জীবনের পরিণাম বিজ্ঞান দেখিয়েছে, তাতে প্রকৃতির খেয়াল ছাড়া এর কোনও গভীর উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোনও মীমাংসাতে পৌঁছতে পারেননি প্রাবন্ধিক। আসলে জীবনকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই মীমাংসা প্রয়োজনহীন। অন্তত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে সুখ বা দুঃখ—কোনও একটি দিকের প্রতি সহমত প্রদর্শন করছেন এমন বলা যায় না। প্রবন্ধের শেষে সেই উচ্চারণই লক্ষ করি,—"মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষভাবে দুই দিক্ দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী ধ্যন দিয়া থাকেন, পাঠকরা মার্জ্জনা করিবেন।"

৩.৪.২ সৌন্দর্য-বুদ্ধি'

মানুষের সৌন্দর্য-বুদ্ধির বিকাশ কীভাবে হয়েছে—এর কোনও সন্তোষজনক মীমাংসাতে বড় বড় পণ্ডিতেরাও পৌঁছুতে পারেননি। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন—"বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে মাত্র, মীমাংসার কোনও চেষ্টা নাই।"

ইউটিলিটি অর্থাৎ হিতকারিতা বা উপযোগিতা দেখেই প্রাকৃতিক নির্বাচন অগ্রসর হয়। যা জীবনের পক্ষে হিতকর, জীবন-সংগ্রামে যা সাহায্য করে, জীব কালক্রমে তাই অর্জন করে। মানুষ দু-পায়ে ভর দিয়ে চলে, মানুষের হাত অস্ত্র নির্মাণের ও অস্ত্রসৃষ্টির উপযোগী, মানুষ দল বেঁধে বাস করে—এ সমস্তই মানুষের জীবনরক্ষার উপযোগী এবং অনুকূল। এইজন্যই প্রাকৃতিক নির্বাচনে এ সকল ধর্মই মানুষ ক্রমশ প্রাপ্ত হয়েছে।

মানুষের শারীরিক শক্তি কম, কাজেই বুদ্ধির জোরে শারিরীক শক্তির অক্ষমতাকে অতিক্রম করে। মানুষের এই বুদ্ধিমত্তা প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল। গায়ের জোর অল্প বলেই মানুষ দলবদ্ধ জীব, দল বেঁধে আত্মরক্ষা, দলের অধীনতা স্বীকার তাকে করতে হয়। আবার মানুষ ভবিষ্যতের সুখ চেয়ে, সমাজের মুখ চেয়ে আত্মসংবরণ করে। এর ফলে ধর্মবুদ্ধির উদ্ভব হয়। এটিও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলশ্রুতি। মানবধর্ম প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন হয়েছে—একথা স্বীকার করে নিতে হয়। এমন একসময় ছিল যখন নরে ও বানরে তফাৎ ছিল না। প্রাকৃতিক নির্বাচনে নানাবিধ অভিব্যক্তির ফলে প্রকৃতই নরে বা মানবে পরিণত হয়েছে। সৌন্দর্য-বুদ্ধিই ঠিক সেরকমই মানবধর্ম।

মানবেতর জীবের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ আছে কি না, বলা জটিল। বাংলায় যাকে বলে সুকুমার কলা, ইংরেজিতে যাকে বলে ফাইন-আর্ট এখানে সেই সৌন্দর্যের কথা হচ্ছে।

তবে ইতরজীবের মধ্যেও একরকম সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা আছে, কিন্তু তা সাধারণ জীবধর্ম, একে বিশিষ্ট মানবধর্ম বলা যেতে পারে না। বিহঙ্গ গান গেয়ে বিহঙ্গীর মন ভোলায়, ময়ূর কলাপ বিস্তার করে নেচে নেচে ময়ূরীর মন জয় করে,—এই শ্রেণির সৌন্দর্যপ্রিয়তা জীবধর্মের অন্তর্গত।

ডারুইন আমাদের জানিয়েছেন যে যৌন নির্বাচনে এই সৌন্দর্যের উৎপত্তি হয়েছে। ময়ূরীর ময়ূরের কলাপবিস্তার করা নৃত্যরত সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলেই ময়ুর সুন্দর হয়েছে। মানুষের মধ্যেও এরকম সৌন্দর্যপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। নারীদেহের সৌন্দর্য এই যৌন নির্বাচন থেকেই উৎপন্ন। "চম্পক-অঙ্গুলের প্রতি খঞ্জন-নয়নের প্রতি পুরুষের অকস্মাৎ অনুরাগ থাকায় নারী চম্পক-অঙ্গুলির এবং খঞ্জন-নয়নের অধিকারিণী হয়েছেন।" কিন্তু জবা, শেফালি ছেড়ে কেন চাঁপার প্রতি এবং প্যাঁচা, হাড়গিলা ছেড়ে কেন খঞ্জন-নয়নের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ হল, তা

বোধগম্য হয় না। 'মনুষ্য যেখানে সেখানে অহেতুক সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়।'

অবশ্য সাধারণ মানুষ যেখানে মুগ্ধ হবার বা আপ্লুত হবার কোনও কারণ দেখে না, সেখানে কবি ও ভাবুক মুগ্ধ হন। এই যে সৌন্দর্যবুদ্ধি, তার জীবনরক্ষার ক্ষেত্রে কোনও কার্যকর ভূমিকা আছে তা প্রমাণ করতে কেউ বোধহয় তৎপর হবেন না।

প্রাবন্ধিকের বক্তব্য যে এই সৌন্দর্যবুদ্ধি স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বরং প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। বরং যাঁরা এই সৌন্দর্যপ্রিয়তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ চিত্রশিল্পী, কারুশিল্পী বা অন্যজাতের শিল্পী যাঁরা তাঁদের সাংসারিক বুদ্ধি সবসময়ই অত্যন্ত প্রশংসনীয় নয়। সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তির প্রাকৃতিক কারণ নির্দেশ একরকম প্রায় অসম্ভব।

আলফ্রেড রসেল ওয়ালশ আমাদের জানাচ্ছেন যে মানুষের সৌন্দর্যবোধের হেতু প্রাকৃতিক নির্বাচনে ব্যাখ্যা করা যায় না। যৌন নির্বাচনেও এর উৎপত্তি নয়। অথচ সৌন্দর্যবোধ মানবত্বের প্রধান লক্ষণ। সৌন্দর্যবুদ্ধি বিবর্জিত মানুষকে পূর্ণ মানবত্ব আখ্যা দেওয়া যায় না। ফলে পূর্ণ মানবত্ব যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল একথাও ঠিক স্বীকার করা যায় না।

ওয়ালশের বক্তব্যের সঙ্গে সকলে সহমত প্রদর্শন করেননি। কিন্তু যেহেতু সৌন্দর্য-বুদ্ধির জীবনসংগ্রামে কার্যকারিতা নেই তখন প্রাকৃতিক নির্বাচনেই সৌন্দর্যবুদ্ধি জন্মাতে পারে, একথাও স্পষ্ট করে কেউ বলতে পারেননি।

জীববিদ্যার পণ্ডিতেরা কেউ কেউ বলতে চান, "এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা একটা bye-product of evolution—জাতীয় অভিব্যক্তির একটা আকস্মিক আগন্তুক আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।" জীবনরক্ষার অনুকূল বিভিন্ন মানবধর্মের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাক্রমে এই বুদ্ধিটা সৃষ্টি হয়েছে। এই বুদ্ধিটি মানুষকে বিনা কারণে খানিকটা আনন্দলাভের উপায় ঘটিয়েছে।

মানুষের সৌন্দর্যানুরাগ আসলে একধরনের নেশা। এর কোনও প্রত্যক্ষ উপকারিতা নেই। বরং সময়ে সময়ে এই নেশা সাংসারিক জীবনে অপকারও করে। তবে একথাও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"তবু ভাল যে সংসারের সকলেই এই মদের মাতাল নহে। সকলেই সংসারের কাজ ছাড়িয়া জোনাকি, আর ফুল, আর ভ্রমর, আর বিরহ লইয়া জীবন কাটায় না।"

বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আসলে উপভোগের সামগ্রীমাত্র। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য দেয় নির্মল আনন্দ। এইজন্যই প্রবন্ধের শেষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বক্তব্যঃ "এই আনন্দ কোন কোন কাজে লাগে, জীবনযাত্রায় কাহারও কোন রকমে হিত করিতে পারে, এরূপ কল্পনা করিতে গেলেও উহার বিশুদ্ধি নষ্ট হয়; উহা যেন মলিন হইয়া যায়।"

৩.৫ ❑ 'সুখ না দুঃখ?' ও 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' প্রবন্ধ দুটির বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ

'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'সাধনা' পত্রিকার ১২৯৯-এর মাঘ সংখ্যায়। পরবর্তীকালে 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি' প্রবন্ধটিও প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক 'প্রদীপ' এর ১৩০৬-এর মাঘ সংখ্যায়। এবং যথারীতি 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবন্ধ দুটি তো বটেই গ্রন্থের বাকি কুড়িটি প্রবন্ধেরও যথেষ্ট সমাদর হয়েছিল সমকালীন বিদ্বজন ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে, যে-কারণে ১৩২১ অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ ঘটে।

প্রবন্ধকার এই আলোচনায় প্রয়াসী থেকেছেন 'সুখ' ও 'দুঃখে'র একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দান করে একটি আলোচনার পরিসরকে উৎসাহিত করতে—জীবনপ্রবাহে ও সভ্যতার বর্ধমানতায় সুখ না দুঃখ কার ভার বেশি? কে পরম্পরিত ধারায় জীবন ও সভ্যতার চলিষ্ণুতায় গতি সৃষ্টি করে চলেছে? প্রকৃতপক্ষে দু'য়ের মধ্যে কে হয়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রা-শক্তি? কোন 'মীমাংসায়' তিনি পৌঁছতে চাননি। প্রশ্নটি নিয়ে তিনি তিন-দিকের মান্য মতগুলির সারসংক্ষেপ নিয়ে পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করতে চেয়েছেন—তিন-দিকগুলি যথাক্রমে, বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্য। তিন-

দিকেরই তাঁর পারঙ্গমতা নিয়ে সমকালীন বিদ্বজনদের মধ্যে কোন মতান্তর ছিল না, অনিন্দ্যসুন্দর এক গ্রহণযোগ্যতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখেরা পূর্বাপর ঐকমত্যেই ছিলেন, বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শনের তিন বেদীতে অধিষ্ঠিত থেকে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে যাবার সামর্থ্য সে-সময়ে তাঁর মতো আর কারও ছিল না।

সন্দর্ভ বা আলোচনাটির প্রাসঙ্গিকতায় চালর্স ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তনবাদের (Theory of Evolution) এর কিঞ্চিদধিক উল্লেখ থাকলেও সত্যের খাতিরে বলতে হয় পটভূমিটিই রচনা করে দিয়েছে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের লিনিয়াম সোসাইটির পত্রিকায় জীবনের বিবর্তনক্রিয়া নিয়ে ওয়ালেম—ডারউইনের যুগ্মগবেষণায় বৃহৎ যে-পত্রটি (paper) প্রকাশিত হয়ে বছরেই অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পাওয়া 'The Orign of Species' মহৎ গ্রন্থটি, যা অনতিবিলম্বে বিজ্ঞানী-গবেষক হাক্সলে, আর্নস্ট হেকেল প্রমুখদের সংযোজন-সংশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে 'ডারউইনবাদ' (Darwinism) নামে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয় প্রথাসিদ্ধ সনাতনী চিন্তা-চেতনার রাজত্বে—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য সৃষ্টির মূলে কোন শক্তিধরের লীলাচাঞ্চল্য বা কারু বাসনা নেই, আছে প্রকৃতি-জলবায়ু-পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া অধিকতর কর্মণ্যদের অভিযোজন-ক্ষমতার গুণাগুণ, আদিমকাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ঘটছে। যার যতিভঙ্গ এখনও ঘটেনি।

প্রশ্ন উঠেছে 'সুখ' এর সংজ্ঞা কী? যাতে তুষ্টি ঘরে, যার দ্বারা 'জীবন বর্ধিত' পরাক্রম প্রাপ্ত হয়। যে জীবনযাপনের বাতাবরণে 'আধিব্যাধি, সর-যাতকনা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, প্রণয়ে কৃত্রিমতা, ধর্ম্মের নিপীড়ন, নিরীহের পেষণ, সকলের উপর ধর্মের মুখোশ-পরা অধর্ম্মের জয়জয়াকার, এ সব নাই এমন নহে ; তবে স্নেহ দয়া ভক্তি মমতা সরলতা প্রেম, ইহারাও আকাশকুসুম বা ভাষার কল্পিত অলঙ্কার নহে' এই জীবন-ধারারই এক একটি Unit বা এককের নাম এক একটি সুখ। এই সুখেরই 'ভালরূপ বন্দোবস্তে' মানুষেরা ব্যাপৃত হয়। সুখ দুই প্রকার (ক) ইন্দ্রিয়জ (খ) জীবনবর্ধক।

ইন্দ্রিয়জ সুখ নিম্নপর্যায়ের। যাতে ক্রমশ 'জীবনবর্দ্ধনের প্রয়াস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস' পায়। জীবন-বর্ধক সুখই সামাজিক চলিষ্ণুতায় গতি সৃষ্টি করে ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সঙ্গতি স্থাপন করে বৃহত্তর-মহত্তর একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। যা একই সঙ্গে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করে—— 'মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্বরক্ষণার্থ প্রয়াস'কে বলশালী করে তোলে। অতএব দুটি সূত্র নির্ণীত হতে পারে।

- "নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং জীবনের প্রবাহ সেই উদ্দেশ্যের মুখেই চলিতেছে বলিয়াই সামাজিক উন্নতি।'
- "মনুষ্যজীবনের ও মনুষ্যসমাজের উন্নতি ক্রমশঃ হইতেছে। ইতিহাস যদি ইহা সমর্থন করে তবে সুখের মাত্রা ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে বলিতে হইবে। কখনও পূর্ণতা না হইতে পারে কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে।'
- প্রকৃতির সমুদয় বিধানই দুঃখের লঘুকরণের অভিমুখী।

  অতঃপর আলোচনায় দুঃখবাদী দার্শনিকদের চিন্তাভাবনার উল্লেখ করেছে।
- 'যার দুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভুগিতে জানে, অতএব ভোগে। যাহার চেতনা নাই, তাহার দুঃখ নাই। নিকৃষ্ট জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ম। সুতরাং দুঃখানুভবশক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি। যেখানে উন্নতি অধিক, সেখানেও দুঃখ অধিক। ..... জীবনে সুখ থাকা অসম্ভব, এবং জীবনের উদ্দেশ্য সুখ নহে। মানুষ বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিতে চায়, তাহাতে সুখের প্রমাণ হয় না, তাহাতে প্রাকৃত শক্তির নিকটে মানুষের পূর্ণ অধীনতা সপ্রমাণ করে মাত্র। মানুষ অন্ধ শক্তির বশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে ; ফাঁদ

এড়াইতে গিয়া ফাঁদে পা দিতেছে ; দুঃখ এড়াইতে গিয়া দুঃখে পড়িতেছে ; তথাপি তাহার জ্ঞান হয় না ; তথাপি সে বাঁচিতে চায়। প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুতুল মানুষ। ইহাই প্রধান রহস্য।"

- "জীবনচেষ্টা যাহাকে বল, সে ত কেবল জীবনরক্ষার বা দুঃখলোপের প্রয়াস মাত্র। কিন্তু হয়, অধিকাংশ স্থলে সেই প্রয়াস কি পণ্ডশ্রম মাত্র নহে? আবার মানসিক জীবনের সমুদয় কার্য্য ; বুদ্ধি, কি চিন্তা কি অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ত কানারই ভরণপোষণ ও পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত। সেই কামনার অর্থ কি? বর্ত্তমান অভাবের, বর্ত্তমান ক্লেশের দূরীকরণের প্রবৃত্তি। অর্থাৎ জীবন মূলেই দুঃখময়, অভাবময়। অভাবময়তা না থাকিলে কামনা থাকিত না, জীবনের প্রয়োজন থাকিত না। জীবনের সজ্ঞাই যেখানে দুঃখময়তা হইল, দুঃখময়তার ক্রমিক প্রবাহই স্রোত হইল, দুঃখময়তার দূরীকরণের নিষ্ফল প্রয়াসেই জীবনের সমাপ্তি হইল, সেখানে জীবনদুঃখময়, কি সুখময় তাহা প্রশ্ন করা বাতুলতা। যেখানে অভাবের শেষ, সেইখানে জীবন-প্রবাহ রুদ্ধ ; অভাবের পরম্পরাতেই জীবলীলা। বাঁধিবার ইচ্ছা, সুখের ইচ্ছা নহে, উহা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির ইচ্ছা, তবে নিষ্কৃতি ঘটে না। জীবন দুঃখময়, যেহেতু জীবন—জীবন।'

স্পষ্টতই পর্যায়ক্রমে দুঃখবাদকে অকারণে পল্লবিত না করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুটি মূল নির্বন্ধের উপস্থাপন ঘটিয়েছেন। দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসই বলে না দুঃমবাদের সব চেয়ে দুই বড়ো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধধর্মকেও যেমন কেন্দ্র করে, তেমনি শোপেনহাওয়ারকে কেন্দ্র করে।

এর পরেই রামেন্দ্রসুন্দর আলোচনাকে নিয়ে গেছেন জাতিগত চরিত্র ও সামাজিক-রাষ্ট্রিক অবস্থান্তরের মধ্যে দিয়ে কীভাবে এক-একটি তত্ত্ব বা নির্ণয় পল্লবিত হয়ে কর্ষিত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় সেই-ঐতিহাসিকতাতেই।

- "স্ফূর্তিমান ইংরেজ যে মোটের উপর সুখবাদী হইবেন বুঝা যায় ; কিন্তু বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জন্মনিতে কিরূপে দুঃখবাদের প্রাদুর্ভাব হইল, ভাল বুঝা যায় না।

এদেশের দার্শনিকদের মুক্তিবাদ বা নির্ব্বাণবাদ এই চিরচন্তন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের আকঙ্ক্ষার ফল। বৈদিক আর্য্যগণের দুঃখবাদী হইবার বড় অবসর ছিল না।....

পরবর্ত্তীকালে জ্ঞানের আকাঙক্ষার সহিত জীবনে অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব দেখা যায়। বৌদ্ধপন্থায় তাহার পরিণতি। দুঃখপাশ হইতে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের চেষ্টাই ভগবান বুদ্ধদেবের জীবন। তারপর হইতে হিন্দুশাস্ত্র নানাভাবে একই কথা বলিয়াছে ; মুক্তিলাভের নানা উপায় আলোচনা করিয়াছে, যিনি যখন বুদ্ধগৌতমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কর্ম্মসংস্কারে হাত দিয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে সেই পুরাতন কথা ; কামনা নিরোধ কর, কর্ম্ম ভস্মসাৎ কর, মুক্তি লাভ করিবে। আধুনিক ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে।"

উদ্ধৃতাংশে দেখা যায় রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চমৎকারিত্ব! সামাজিক রাষ্ট্রিক-অর্থনৈতিক প্রগতি-আধোগতি-বন্ধ্যাত্বই তো গড়ে দেয় একই সঙ্গে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির মনঃস্তত্ত্ব। প্রত্যয়ে কখনও করে তোলে কর্মবীর উদ্যমী প্রত্যয়ী কখনও দহনে-দাহনে ন্যুব্জ কুব্জ কূটকচালে। ইংরেজ তো 'স্ফূর্তিমান জাতি' হবেই, ১৭৪০-৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যেভাবে দেহটা বড়ো যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে বড়ো-মাঝারি-ছোটো বাণিজ্য-উৎপাদন বিপণনের সঙ্গে জড়িয়ে উন্নতির শিখরে উঠে গেল। তাতে আত্মপ্রত্যয়ে প্রথাসিদ্ধতার সব কিছুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পৃথিবীটাকে নতুন করে গড়ে তোলার আগ্রহে উদীপ্ত হতেই তো পারে। জার্মানি তো তা পারে না, য়ুরোপের জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর্যজাতীয়ত্বের অহংকার থাকলেও তারা তো সেই-জাত্যভিমানে নিজেদের স্বতন্ত্রতা ভুলে এক হতে পারেনি। সাড়ে তিনশো জাতিগোষ্ঠীকে বিসমার্ক চেষ্টা করেও সেভাবে এক করতে পারেনি। অধিকন্তু সমুদ্রযাত্রায় দেশ-মহাদেশ পাড়ি দিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনও সেভাবে সময় থাকতে বোঝে নি,

খনিজ সম্পদে প্রাণীজ সম্পদে প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পন্ন থেকেও নিজেকে সময় থাকতে সেভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, অধিকন্তু নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিয়ে, চিরশত্রু ইংরেজদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কেবলই দগ্ধেছে, এই-বাতাবরণে দুঃখবাদের জয়জয়াকার তো ঘটতেই পারে না। (বস্তুত ইংরেজ শাসকরা সতর্ক ছিল জার্মান জাতি সম্পর্কে। কোনভাবে উপনিবেশে তাদের প্রভাব যেন না বেড়ে যায় এ সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবেই সচেতন ছিল। ফলে জার্মান জাতি সম্পর্কিত কোন তথ্যই প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে এসে পৌঁছতো না। ফলে রামেন্দ্রসুন্দরকে মন্তব্য করতে হয় 'বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জর্ম্মাতে কিরূপে দুঃবাদের প্রাদুর্ভাব হইল বুঝা যায় না।' যে-কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদী যুগের প্রচ্ছায়ের মধ্যেই বৌদ্ধ-ধর্মের শূন্যবাদ ভারতবাসীকে গ্রাস করে নেয়। নির্বাণতত্ত্বের মূলে না গিয়েই সরলীকরণ-তরলীকরণের মধ্যে দিয়ে তাকে মনে-প্রাণে বরণ করে নেয়। সাধারণের পরম্পরিত জীবধারায় যে দহন-দাহন তথা যন্ত্রণাময়তার লঘুকরণ কখনও ঘটে না। বরং তীব্রতা বেড়েই যায়—— এক শাসক যায়, অন্য শাসক আসে কিন্তু শোষণের কোন ব্যত্যয় ঘটে না। ফলে বিমর্ষতা-অবসাদ-নঞর্থকতা ভারতবাসীর 'অস্থিমজ্জায়' মিশে যায়।

এর পরেই প্রবন্ধকার আলোচনাকে নিয়ে গেছেন সুখ-দুঃখের তুল্যমূল্যতায় বিশ্বসাহিত্যের প্রশস্ততায়। সংক্ষিপ্ততর সংহত থেকে সংহততর মন্তব্যে—— সমকালীন ইংরাজি সাহিত্য বাংলাসাহিত্য থেকে শুরু করে মধ্যযুগের ইংরাজি সাহিত্য তা বটেই ভারতীয় সাহিত্যের সেই-সে-চিরায়ত অংশগুলির আলোচনায় যে-আলো বিকীর্ণ করে তুলেছেন তা উৎকীর্ণ মণিমুক্তোরই সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে। যেমন,

- 'রামায়ণ মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ-সঙ্গীত।'
- 'কালিদাস যে কখনও সুখ ও সৌন্দর্যছাড়া আর কিছু ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না।'
- 'সেক্সপীয়রের মনঃ কল্পিত পরীরাজ্যের চঞ্চল স্ফূর্ত্তিমত্তা মনে পড়ে, যাহা এলিজাবেথের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান টানে ফুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু যেখানেই সেক্সপীয়র জীবনের রহস্যভেদের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখনেই প্রীতির নৈরাশ্য, ধর্ম্মের অবমাননা ও জীবনের নিস্ফলতায় উষ্ণ শ্বাস ফেলিয়াছেন।'
- 'বন্ধু-শোকার্ত্ত টেনিসন বিশ্বলীলায় প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির ঠাহর না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়াছেন।'
- 'বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষীণপ্রাণা অসহায়া কুন্দনন্দিনীর মৃতদেহের সহিত জগৎ-সংসারের বিষবৃক্ষকেও দগ্ধ দেখিতে পারিলে শান্তির আশা কখনও বা জন্মিতে পারে। কৃতবিদ্য বাঙালি রামায়ণ-মহাভারত ইলিয়ড-অডিসি পড়বেন, কালিদাস-শেক্সপীয়র পড়বেন এ তেমন কিছু প্রশংসনীয় নয়, কিন্তু তা বলে সমকালীন 'Poet Laureate' টেনিসন? যে টেনিসন ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বন্ধ হ্যাল্‌মের মৃত্যুজনিত বিয়োগব্যথা নিয়ে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে 'In Memoriam' লিখেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর বিশ্লেষণে সেই টেনিসনের 'In Memoriam' এরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ রেখেছেন! কবি-সমালোচক একটি লেখার প্রমথ চৌধুরীর প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন—— দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সাম্প্রতিকতম খোঁজখবরে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন অদ্বিতীয়। এখন দেখা যাচ্ছে সেই-শিরোপার দাবিদার রামেন্দ্রসুন্দরও হতে পারেন। সঙ্গে তাঁর মুকুটে বাড়তি একটি পালকও যুক্ত হতে পারে, যার নাম হৃদয়বত্তার সৌকুমার্য—— তা না হলে বঙ্কিচন্দ্রর 'বিষবৃক্ষ'এর সপ্রশংস উল্লেখনে নির্মল-হৃদয়ের একবোঞতা কী মেশানো যায়?

রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের নাম 'সত্য'। সেখানে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়েছেন 'মানবজীবনের সহিত সত্যের সম্বন্ধ'। যে-সত্যের কর্ষণা করতে হয় ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধি ও মর্যাদা অর্জনের জন্যে নয়। যে-সত্যের মন্থনে সুখদুঃখ সম্পর্কে সমান নির্লিপ্তি-নিরাসক্তি ভাব নিয়ে কাজ করে যেতে হয়। অহরহ কাজ 'পুরস্কারের আশা নাই; ভাল ছেলে হও ত বিহিত বিধানে জীবনের কাজ কর। বৈরাগী হইও না ; প্রকৃতির এই উপদেশ।' রামায়ণ থেকেও তিনি

নিজে এই জীবন-বাণী আহরণ করেছেন 'সংসারে দুঃখ আছে ; নিস্তারের উপায় নাই ; কিন্তু জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। সমাজের সেবা কর। বৈরাগী হইও না।

'সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি' প্রবন্ধটিও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জ্ঞানন্বেষণের তীব্র ব্যাকুলতার স্বাক্ষর হয়ে আছে। এখানে তিনি আলোচনার বিষয়বস্তু করেছেন 'মানুষের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ হইল কি রূপে? 'যাহা কিছু কাজে লাগে, যাহা জীবনের পক্ষে হিতকর, যাহা জীবনসংগ্রামের অনুকূল। কোন না-কোন রূপে জীবন সংগ্রামে যাহা সাহায্য করে, জীব কালক্রমে তাহাই অর্জন করে'—অর্জিত এই সব উপচারগুলিকেই রামেন্দ্রসুন্দর এক কথায় বলেছেন 'মানবধর্ম'। 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি মানবধর্ম।" রামেন্দ্রসুন্দরের বেশির ভাগ প্রবন্ধের যা বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের মিশে যাওয়া, এই প্রবন্ধের মধ্যেও তার কোন অপহ্নব ঘটেনি। কেননা যে-বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চেয়েছেন সেখানে বিজ্ঞানের নজির পাওয়া কঠিন—মানুষ পৃথিবীতে বাস করছে এক মিলিয়ন বৎসরেরও বেশি, অথচ সেই-বসবাসের ধরনধারণের লিখিত ইতিহাসে বড় বেশি হলে পাঁচ হাজার বছর সন্নিবেশিত হয়েছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদে মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার মূল সূত্রটি উদঘাটিত হলেও তথ্য-নজির নিয়ে 'সেই-হয়ে ওঠার' ক্রমপর্যায়গুলি আলোকিত হয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষত নৃ-বিজ্ঞানীদের অভিমত অনুযায়ী সবচেয়ে ন্যূন-ঊন মানুষের যে-স্তর 'পিথেকান্ত্রোপাস' এবং সর্বাপেক্ষা উন্নত যে স্তর 'অ্যান্থ্রোপয়েড'—— এই দু'য়ের মধ্যে কয়েক লক্ষ বছর শূন্যতা সৃষ্টি করে আছে। এই শূন্যস্থান ভরাট করতে পারে একমাত্র 'ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক কল্পনা। যে-কল্পনায় গর্ডন চাইল্ড লিখেছেন 'Man Makes himself', পরবর্তী সময়ে জে ডি বার্নাল লিখেছেন 'Social Function of Science' সেই একই মেধাবী-কল্পনায় রামেন্দ্রসুন্দর আলোকসম্পাত করে গেছেন মানুষের পরম্পরা কীভাবে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নেয় কীভাবে 'আত্মরক্ষা'র জন্যে, 'বংশরক্ষা'র জন্যে, 'জাতিগত জীবনরক্ষা' জন্যে 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনগুলি'র সাহায্য নিয়ে সভ্যতার পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে হয়। প্রাবন্ধিকের ভাষায়, 'যাহা কিছু কাজে লাগে, যাহা জীবনের পক্ষে হিতকর, যাহা জীবন সংগ্রামে অনুকূল, কোন না-কোন রূপে জীবনসংগ্রামে যাহা সাহায্য করে, জীব কালক্রমে তাহাই অর্জন করে। মানুষ দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, মানুষের মাথায় একরাশি মস্তিষ্ক আছে, মানুষের হাত দুইখানা অস্ত্রনির্মাণের ও অস্ত্রপ্রয়োগের উপযোগী, মানুষ ঘর বাঁধিয়া বাস করে, মানুষ স্পষ্ট ভাষায় কথা কহিয়া পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে, এ সমস্তই মানুষের জীবনরক্ষার উপযোগী ও অনুকূল। অতএব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এ সকল ধর্ম্মই মানুষ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইয়াছে।" (সৌন্দর্য-বুদ্ধি) ধর্ম বলতে প্রাবন্ধিক বোঝাতে চেয়েছেন প্রকৃতিগত উপাদানকে—— যা স্বতই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়, দিনচর্যার মধ্যে দিয়ে যা ক্রমশই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা আকারপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে।

- কান্ট তাঁর 'Critique of pure Reason' গ্রন্থে 'পূর্বতঃ সিদ্ধতা' বলতে যা বুঝিয়েছেন, বাংলা চলতি কথায় যাকে বলা যায় স্বতঃসিদ্ধতা। সেই 'সার্বিক-বচন' থেকেই অতঃপর তিনি আলোচনার গভীরে গিয়েছেন 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি মানবধর্ম'। মানবধর্মের সঙ্গে এক্ষেত্রে জীবধর্মের সঙ্গে এক করে দেখলে চলবে না। মানবধর্ম মানুষকে সামাজিকত্বের স্তরে উন্নীত করে। যে কারণে 'পরের মুখ চাহিয়া ও ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া মানুষকে আত্মসংবরণ করিতে হয় ; বর্ত্তমান কামনা, বর্ত্তমান বাসনা, বর্ত্তমান লালসা, বর্ত্তমান প্রবৃত্তি দমনে রাখিতে' প্রয়াসী হতে হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় এই-প্রয়াসের নামই ধর্মবুদ্ধি। যা মানুষকে স্থূল কার্যকারিতার অঙ্ক কষা থেকে বিরত করে। এই প্রয়াসই সৌন্দর্য-সন্দর্শনের প্রেরণা দেয়। এই প্রেরণা 'মানবেতর জন্তুর' হয়ত বা নেই। 'ইতর জীবের সৌন্দর্য্যবোধ আছে কি না বলা কঠিন। ইংরাজীতে যাহাকে ফাইন আর্ট বলে, বাঙ্গালাতে যাহাকে সুকুমার কলা বলা হয়েছে। সেই ফাইন আর্টের যে সৌন্দর্য্য লইয়া কারবার, আমি সেই সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি। ইংরাজীতে যাহাকে ইস অথেটিক বৃত্তি বলে, বঙ্কিমবাবু যাহার চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি নাম দিয়াছেন, তাহারই সহিত এই সৌন্দর্য্যের কারবার।

- সৌন্দর্যবোধ বা সৌন্দর্যবৃদ্ধির সঙ্গে অতঃপর যৌনতার সম্পর্ক বা 'যৌন নির্ব্বাচনের' আলোচনাটিকে উত্থাপন করেছেন। প্রকারান্তরে যাকে 'সাধারণ জীবধর্ম্ম'ও বলা যেতে পারে। যার বলে 'বিহগা গান গাহিয়া বিহগীর মন ভুলায় ; কপোত মণিতানুকারী ধ্বনির দ্বারা কপোতীর মন ভুলায় ; ময়ুর কলাপশোভা বিস্তার করিয়া কেকা-রব সহকারে নাচিয়া নাচিয়া ময়ূরীর মন ভুলায়।' যে-কারণে সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় 'নারীদেহের সৌন্দর্য এই যৌন নির্ব্বাচন হইতেই উৎপন্ন। চম্পক-অঙ্গুলির প্রতি ও খঞ্জন-নয়নের প্রতি পুরুষের অকস্মাৎ অনুরাগ থাকায় নারী চম্পক-অঙ্গুলির ও খঞ্জন নয়নের অধিকারিণী হইয়াছেন।'
- তবু এই যৌনতা বা সৌন্দর্যের কার্যকারিতা নিয়ে মানুষের মানবত্বের সার্বিক ধর্ম নয়। মানুষের মধ্যে অহেতুক সৌন্দর্য দেখার একটা ঝোঁক আছে। স্থূল কার্যকারিতার ঊর্দ্ধে ওঠার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। অনেকের মতে 'মানবত্বের প্রধান লক্ষণই শুধু নয়, সর্ব্বপ্রধান লক্ষণও বটে।' এর সঙ্গে আপতভাবে 'জীবনরক্ষা' ও 'বংশবৃদ্ধি'র ব্যবহারিক লাভালাভ বা উপযোগিতা কিছু নেই, ব্যবহারিক দিক থেকে 'অর্থ ও তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। মনুষ্য যেখানে সেখানে অহেতুক সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়।' যদিও সব 'মনুষ্য নয়' কোন কোন মনুষ্য। তাদের 'এই সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির জীবন রক্ষার কোন কার্যকারিতা আছে, তাহাও বোধ হয়। কেহ সপ্রমাণ করিতে যাইবেন না। বরং ইহাতে জীবনের প্রতিকূলতা করে। যিনি এইরূপ সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বতা প্রশংসনীয় হয় না। চিত্রশিল্পী পটের উপর পাঁচরকমের বর্ণের বিন্যাসকরিয়া অপরূপ রূপের সৃষ্টি করেন, কলাবৎ নানারকমের স্বরবিন্যাস দ্বারা বিবিধভাবের উদ্বোধন করিয়া আনন্দের সৃষ্টি করেন ; কারুশিল্পী প্রস্তরে পাঁচ রকম দাগ কাটিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখান। এই সকল সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্য কোথা কিরূপ কি উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হইল, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে না। এই সকল বস্তুর কোথায় সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহার আবিষ্কারেও সকলে সমর্থ হয় না ; অথচ যিনি ভাবগ্রাহী বা সমঝদার, তিনি এই সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া পুলকিত ও মোহিত হইয়া পড়েন।'
- এখানে তিনি আর একটি নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন,—— এই সৌন্দর্য-বুদ্ধি সবাই পায় না, কেউ কেউ পায়। ব্যক্তিগত চয়ন বা অর্জন। অব্যহিত সময়ে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ এই-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'কেকাধ্বনি'। সেখানে রামেন্দ্রসুন্দরের বাস্তব-জীবনে অকার্যকারী এই সৌন্দর্য-বুদ্ধিকেই চিহ্নিত করেছেন বৌদ্ধিক বা মননজাত সৌন্দর্য বলে। স্পষ্টতই সৌন্দর্যের শ্রেণি নির্ণয়ে দুই শ্রেণির সৌন্দর্যকে চিহ্নিত করেছেন (ক) ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য (খ) মননজাত সৌন্দর্য বা বৌদ্ধিক সৌন্দর্য। প্রথম ধারার সৌন্দর্যটি আসে জৈবিকতার সূত্রে, জীবন ধারণের সহজ ও সরল ধারায়। দ্বিতীয় ধারার সৌন্দর্যটি আসে না—তাকে অর্জন করে নিতে হয়, যেখানে প্রয়োজন কোন ভূমিকা নিতে পারে না, যার তথাকথিত ইন্দ্রিয়সুখ পূরণের কোন ক্ষমতাই নেই।
- রবীন্দ্রনাথের 'কেকাধ্বনি'র মতো রামেন্দ্রসুন্দরও তাঁর এই প্রবন্ধে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন "বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য কেবল উপভোগের সামগ্রী—ইহার ফল বিশুদ্ধ নির্ম্মল আনন্দ। এই আনন্দ কোন কোন কাজে লাগে ; জীবনযাত্রায় কাহারও কোন রকমে কোন হিত করিতে পারে, এরূপ কল্পনা করিতে গেলেও উহার বিশুদ্ধ নষ্ট হয়, উহা যেন মলিন হইয়া যায়। কোনরূপ লাভের, কোনরূপ হিতের সম্পর্ক আনিতে গেলে উহার শুদ্ধতা থাকে না। কোন প্রাকৃতিক কারণে এই আনন্দের উৎপত্তি নির্দ্দেশই বোধ হয় অসম্ভব।"
- 'বোধহয় অসম্ভব।' রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল বলেই এই-সংশয়টি শেষাবধি রেখে আলোচনার যতি টেনেছেন। কেননা যে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ-সংশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়,

কোন একটি উদ্ভাবন পরবর্তীকালে উক্ত-সিদ্ধান্তকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। বিজ্ঞানের সেই-চলিষ্ণুতা আছে। 'জীবন রক্ষার যে কিসে কিরূপে সাহায্য করে, তাহা সাহস করে বলা কঠিন। এই বিষয়টাকে আমার কোন উপকার হয় নাই, কখনও উপকার হইতে পারে, ইহা জোর করিয়া বলা নিতান্ত দুঃসাহসিকের কাজ। সৌন্দর্য-বুদ্ধিও মানব-জীবনে কোনরূপ আনুকূল্য করে না, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ ; এবং যদিও মানব-জীবনে ইহার কোনরূপ উপকারিতা খুঁজিয়া বাহির করা যায়' তাহলেই সিদ্ধান্তের রদবদলের আবশ্যিকতা এসে পড়ে।

সমসাময়িক সময়ে সৌন্দর্যের ভেতর-বাইর নিয়ে ব্যাপক চর্চা চলেছিল। সৌন্দর্য কী? কোথা থেকে আসে? তা কতখানি ভোগের, কতখানি-বা ভোগাতিরিক্ত সংবেদনার? স্থূল প্রয়োজন বা যৌনতাই কী মানবজীবনের চালিকাশক্তি। রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি'তে খোলাখুলি সে-সব প্রশ্নই তুলেছেন। প্যারিস একজিবিশনের ফরাসীশিল্পী কারোল্যু-দ্যুরাঁরার আঁকা নগ্নিকা দেখে মুগ্ধ মতামত জানাচ্ছেন : 'চিত্রাশালায় প্রবেশ করে কারোল্যু ডুঁরা নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর রচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখলুম। কি আশ্চর্য সুন্দর! সুন্দর মানব শরীরের মত সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি। কিন্তু মর্ত্ত্যের সেই চরম সৌন্দর্য্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্ব্বশেষ কীর্ত্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই ছবিখানি দেখলে চেতনা হয় পশুমানুষ বিধাতার স্বহস্তরচিত একটি মহিমাকে বিলুপ্ত করে রেখেছে, এবং চিত্রকর মনুষ্যরচিত অপবিত্র আবরণ উদঘাটন করে সেই দিব্য সৌন্দর্য্যের আভাস দিয়ে দিলে।' ('য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী')

'পশুমানুষ' এবং 'পশুত্ব-বিবর্জিত মানুষ'এর ধর্মাধর্ম নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সেই-সময়ের অন্যতম জ্ঞানানুশীল ললিতকলা চর্চার অন্যতম বিষয়ই হয়ে উঠেছিল— যে কারণে নবীন যুবক বলেন্দ্রনাথকেও 'ভারতী ও বালক' এর ১২৯৬-এর পৌষ সংখ্যায় লিখতে হয় 'নগ্নতার সৌন্দর্য্য' নামক প্রবন্ধ। সেক্ষেত্রে কাব্য-বিজ্ঞান-দর্শনের ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরকে কী তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে থাকলে চলে। 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি'র পরেও তাঁকে তাই লিখতে হয় 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' নামক প্রবন্ধটি। পাঠকদের উদ্দেশে জানিয়ে রাখা ভালো প্রকাশের দিক থেকে 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' আগে প্রকাশিত হলেও (১৩০০, ভাদ্র সংখ্যা, সাধনা) রচিত হয়েছিল 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি'র পরে, অনেকটা পরিপূরক হিসেবেই।

❑ সামগ্রিক অনুশীলনী

বিস্তৃত প্রশ্ন :

'সাম্য' □ ১. "কমুনিজ্‌ম সেই বৃক্ষের ফল, ইন্টারন্যাশনাল সেই বৃক্ষের ফল।"—এই মন্তব্যটির প্রসঙ্গোল্লেখ করে এর সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করুন।

২. "সাম্যাবতার যীশুখ্রীষ্ট"—এই মন্তব্যটি কোন্ প্রসঙ্গে করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র? এই সূত্রে তাঁর খ্রীষ্ট সম্পর্কিত ধারণারও পরিচয় দিন।

৩. 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রুশো এবং ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন সেগুলির যৌক্তিকতা নির্ণয় করুন।

৪. 'সাম্য' প্রবন্ধ অবলম্বন করে প্রাবন্ধিক-বঙ্কিম সম্পর্কে আপনার অভিমত দিন।

৫. 'সাম্য' নিবন্ধটির একটি আনুপূর্বিক ভাবসংক্ষেপ রচনা করুন।

'কৌতুক হাস্য'/

'কৌতুক হাস্যের মাত্রা' □ ১. 'পঞ্চভূত' কি ডায়ারি-ধর্মী রচনা, না একে রম্য রচনা বা belle-letter বলা যায়? 'কৌতুক-হাস্য' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' অবলম্বনে এই প্রশ্নের উত্তর দিন।

২. কৌতুকের হাসি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার স্বরূপটি নির্ণয় করুন।

৩. "মাত্রাভেদের তারতম্যতেই হাসিকান্না উদ্রিক্ত হয়"। এই অভিমতের যাথার্থ্য যাচাই করুন।

৪. 'কৌতুকহাস্য' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধদুটিতে বিষয়গত সাদৃশ্য থাকলেও উপস্থাপনার পার্থক্য আছে কি-না, বিচার করে দেখান।

৫. 'কৌতুকহাস্য' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' নিবন্ধদুটির মূল প্রতিপাদ্য কী-কী, নিজের কথায় ব্যক্ত করুন।

'সুখ না দুঃখ'/

'সৌন্দর্যবুদ্ধি' □ ১. 'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সুখবাদী এবং দুঃখবাদীদের অভিমত স্বতন্ত্রভাবে যে-যে যুক্তিপরম্পরায় বিন্যস্ত করেছেন, তার পরিচয় দিন। সেই সূত্রেই মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখের মধ্যে কোন্‌টির আধিক্য আছে, নিজের যুক্তিসহ সেই আলোচনা করুন।

২. "সুখান্বেষণের চেষ্টার ফলেই জৈবিক অভিব্যক্তি"—রামেন্দ্রসুন্দরের এই মন্তব্য কতটা যথার্থ, আলোচনা করুন।

৩. "সৌন্দর্যবুদ্ধি মানবধর্ম"—রামেন্দ্রসুন্দরের এই কথার তাৎপর্য নির্ণয় করুন।

৪. মানুষের সৌন্দর্যবুদ্ধির বিকাশ কীভাবে হয়েছে, রামেন্দ্রসুন্দরের অনুসরণে তার পরিচয় দিন।

৫. 'সুখ না দুঃখ' এবং 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' প্রবন্ধদুটির অবলম্বনে প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় দিন।

অবিস্তৃত প্রশ্ন :

'সাম্য' □ ১. "তুমি আমি দেশের কয়জন?"—এই কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী?

২. যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন তাই প্রকৃত বৈষম্য।—কেন, সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন।

৩. "তৃতীয় সাম্যাবতার রুশো।"—আগের দুজন কে-কে? বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের তাৎপর্য কী?

৪. 'পরাণ মণ্ডল' কে? তাঁর অনুষঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কী বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন?

৫. সমাজে "ধনসঞ্চয়" কীভাবে সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছিল?—সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬. পুরুষ ও নারীর অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কী-কী প্রস্তাব করেছেন?

৭. বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরকালে সাম্যভাবনাকে পরিত্যাগ করেছিলেন কেন?

৮. "বুদ্ধ্যপজীবী" বলতে বঙ্কিমচন্দ্র মূলত কাদেরকে বুঝিয়েছেন?

'কৌতুকহাস্য' /

'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' □ ১. "মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে পারে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে।"—এটি কার কথা? এর গূঢ়ার্থ কী?

২. "কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।"—এই তত্ত্বর সারবত্তা কতখানি সংক্ষেপে বলুন।

৩. "নারীর হাসি অকারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা অনেক মন্দাক্রান্তা, উপেন্দ্রবজ্রা, এমন-কি শার্দুল বিক্রীড়িতচ্ছন্দ অনেক ত্রিপদী, চতুষ্পদী এবং চতুর্দশপদীর আদিকারণ হইয়াছে শুনা যায়।"—এই মন্তব্যের তাৎপর্য কী?

৪. "অসংগতি" কীভাবে কমেডি এবং ট্র্যাজেডি, দুয়েরই বিষয় হতে পারে, বলুন।

'সুখ না দুঃখ?/

সৌন্দর্যবুদ্ধি □ ১. "সর্বক্ষণেই তদানীন্তন দুঃখের মাত্রা অপেক্ষা তদানীন্তন সুখের মাত্রা অধিক"—কেন? সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন।

২. মানুষ অন্ধশক্তির হাতের পুতুল মাত্র।—এই ধারণা কতদূর যথার্থ?

৩. ডারুইনের মতানুসারে, কীভাবে সৌন্দর্যের উৎপত্তি হয়েছে ব্যাখ্যা করুন।

৪. রামেন্দ্রসুন্দর সৌন্দর্যের শ্রেণিনির্ণয় কীভাবে করেছেন, দেখান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

'সাম্য' □ ১. বাংলার সারস্বত সমাজে সাম্যচিন্তার পথিকৃৎ কে ছিলেন?

২. 'Govinda Samanta' গ্রন্থ কে লিখেছিলেন?

৩. 'Property is theft' কে বলেছিলেন?

৪. "মানুষ্যে মানুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ" কে বলেছিলেন?

৫. 'Le Contrat Sociel' কার লেখা?

৬. বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতে "শ্রমোপজীবী"-দের অবনতির কারণ কী-কী?

৭. "পত্নীবিযুক্ত পতি এবং পতিবিযুক্ত পত্নী" কিসের অধিকারী?

৮. হিন্দু মহিলাদের কোন্ "কুৎসা" বঙ্কিমচন্দ্র 'সহ্য করিতে" পারেন না?

৯. "ইন্টারন্যাশনাল" কোন্ "বৃক্ষের ফল"?

১০. "সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দশায় ....." —উদ্ধৃতিটি সম্পূর্ণ করুন।

কৌতুকহাস্য' /

'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' □ ১. "বাসরঘরে" হাস্যরস বলে "বঙ্গসীমন্তিনীগণ" কী কী ব্যাপারকে স্থির করেন?

২. "বিচিত্রবর্ণের নাগপাশবন্ধন" বস্তুটি কী?

৩. ব্যোমের লাঠিগাছাকে ক্ষিতি কী বলে অভিহিত করেছিল?

৪. নিউটন "জ্ঞানসমুদ্রের কূলে" কেবলমাত্র কী কুড়িয়েছিলেন?

৫. ফলস্টাফের "দুর্গতির একশেষ" লাভের হেতু কী ছিল?

৬. দুর্ভিক্ষ কার কাছে "পরম কৌতুকাবহ"?

'সুখ না দুঃখ? /

'সৌন্দর্যবুদ্ধি' □ ১. 'সুখ না দুঃখ?' এবং 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' প্রবন্ধদুটি কবে, কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

২. রামেন্দ্রসুন্দর "মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব" এবং তার "রক্ষাপ্রয়াস"-কে কী বলে ভেবেছিলেন?

৩. "জীবন দুঃখময়' কেন?

৪. "মনুষ্য যেখানে সেখানে" কী "দেখিতে পায়"?

৫. "বিশুদ্ধ সৌন্দর্য" কিসের "সামগ্রী"?

৬. "চম্পক অঙ্গুলির ও খঞ্জন নয়নের অধিকারিণী" কে, কেন?

❑ গ্রন্থপঞ্জি ঃ

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ঃ ভবতোষ দত্ত

বঙ্কিমবরণ ঃ মোহিতলাল মজুমদার

বঙ্কিমসরণি ঃ প্রমথনাথ বিশী

Bankimchandra Chattapadhyay : Sri Aurobindo

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ আধুনিক মন ঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত।

রবীন্দ্র সরণি ঃ প্রমথনাথ বিশী।

বাংলা সাহিত্য হাস্যরসের ধারা ঃ অজিতকুমার ঘোষ।

রবীন্দ্রজীবনী ঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলসূত্র ঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের একদিক ঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ঃ জানকীনাথ ভট্টাচার্য।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ঃ বিপিনবিহারী গুপ্ত।

ঊনিশ-বিশ ঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যসাধক চরিত মালার

'সত্তর' সংখ্যক পুস্তিকা ঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।